সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ
(১৮৮৮-১৯৭৫)

রাধাকৃষ্ণাণ-এর জন্মদিন। সেদিন আমরা শিক্ষক দিবস পালন করি।

—রাধাকৃষ্ণাণ খুব বড়ো পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। গোটা পৃথিবীতে ওঁর সম্মান ছিল। খুব ভালো শিক্ষকও ছিলেন উনি। তাইতো ওঁর জন্মদিনে শিক্ষক দিবস পালন করো তোমরা।

ফুলমণি বলল— শিশু দিবস তো জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। শিশুদের উনি খুব ভালোবাসতেন। সেদিনটা তাই আমরা *শিশু দিবস* হিসেবে পালন করি। বাবা সাহেব আম্বেদকরও আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ। উনি ভারতের সংবিধান বানিয়েছিলেন। তাই সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আবুল কালাম আজাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। স্বাধীনতার জন্যও তিনি লড়াই করেছিলেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
(১৮৮৮-১৯৫৮)

সাকিল বলল—সাধারণতন্ত্র দিবস কেন পালন করি আমরা?

— সাধারণতন্ত্র মানে হল সাধারণ মানুষই দেশ চালাবে। ‘রাজার ছেলে রাজা হবে’ এমনটি চলবে না। আজ যে সাধারণ লোক, সেই পরে ভোটে জিতে সরকারের প্রধান হতে পারে। স্বাধীন দেশটা কেমন করে আমরা চালাব তার এমন নিয়ম চালু হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই তারিখটাই ভারতবর্ষের সাধারণতন্ত্র দিবস।

— এই দিনটাও পালন করা উচিত।

— আর কোন কোন দিবস পালন করতে চাও ? তা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো। আমরা ক্লাসের মধ্যেও পালন করতে পারি।

বলাবলি করে লেখো

আর কোন কোন দিবস পালন করতে চাও? তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো :

তারিখ	কেন পালন করতে চাইছ	কী দিবস নাম দেবে	কীভাবে পালন করতে চাও

কেউ যেন না হারিয়ে যায়

আর কোন দিবস পালন করব ? এই নিয়ে অনেক তর্ক হলো।

মৈরাং বলল - বীরসা মুণ্ডার জন্মদিন পালন করব। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন বীরসা।

বীরসা মুন্ডা আর তাঁর সঙ্গীরা বনভূমিতে বসবাসের অধিকার রক্ষার জন্য ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

ইমদাদ বলল- আমার নানা-নানি এসেছিলেন। ওঁরা উত্তর ২৪ পরগনায় থাকেন। তাঁরা বীরসার নাম শুনেছেন। কিন্তু তাঁর লড়াইয়ের কথা খুব ভালো করে জানেন না। নানা

আমাকে বললেন, তুমি স্কুল থেকে ভালো করে বীরসার বিষয়ে জেনো। তবে ওঁরা বলেন তিতুমিরও ইংরেজদের বিরুদ্ধে খুব লড়েছিলেন ।

ফুলমণি বলল - বেশ তো। সবার কথাই জানতে হবে। দেশকে ভালোবেসে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সবার কথাই জানা দরকার।

তিতুমির ও তার সঙ্গীরা ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সঙ্গী জমিদারদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

স্যার বললেন - ঠিকই তো। ইংরেজরা অন্যায়ভাবে চাষের জমি কেড়ে নিয়েছিল। জঙ্গল কেটে ফেলেছিল। রেশম চাষ নষ্ট করতে বাধ্য করেছিল। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল অনেক সাধারণ মানুষ। বীরসা মুণ্ডা, সিধো ও কানহু,

সিধো মূর্মু

তিতুমির সবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এঁরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ। তির-ধনুক নিয়ে হাজার-হাজার মানুষ মোকাবিলা করেছিল ইংরেজ সেনার। তিতুমির বানিয়েছিলেন বাঁশের কেল্লা। সেই বাঁশের কেল্লা ইংরেজদের কামানের ঘায়ে ভেঙে যায়। কিন্তু দেশের মানুষ তিতুমিরের লড়াইকে মনে রেখে দিয়েছে। তবে নিজের এলাকার যাঁরা ভালো কাজ করেছেন তাঁদের কথাও নিশ্চয়ই জানবে। অন্য সমস্ত অঞ্চলের কথাও জানার চেষ্টা করবে।

বিরসা মুণ্ডা

সুফল বলল— দিদিদের কলেজ করেছিলেন আরতির ঠাকুরদা। তিনি আর আরতির ঠাকুমা দুজনেই স্বাধীনতার

জন্য জেল খেটেছিলেন। আমরা তাঁদের জন্মদিন পালন করব?

— নিশ্চয়ই। সেইসব দিনে তাঁদের সম্পর্কে জানা হবে। কলেজ হওয়ায় কী সুবিধা হয়েছে সে আলোচনা হবে। শুধু দিবস পালন নয়। নিজের এলাকার মানুষদের ভালো ভালো কাজের কথা আগে বুঝব। নইলে ভালো কাজ কথাটার মানে বুঝব কী করে?

হীরামতি বলল— এই তো, আমরা নানা পশুর মুখোশ তৈরি করি। মুখোশ পরে নাচ-গান করি। এগুলো দেখতে সবাই ভালোবাসে। এগুলো করা ভালো?

— নিশ্চয়ই ভালো। অনেক জায়গাতেই অনেক লোক এখন এরকম মুখোশ নাচ করছে।

মৈরাং বলল — বিষ্ণুপুরে টেরাকোটার কাজ হয়। দিঘায় ঝিনুক দিয়ে মূর্তি গড়ে।

— কোথাও সুন্দর মাদুর হয়। কোথাও বেতের জিনিস হয়। কোথাও সুস্বাদু সরপুরিয়া হয়। এগুলো আঞ্চলিক ঐতিহ্য। এগুলো যেন না হারায়।

বলাবলি করে লেখো

১। তোমার এলাকার যেসব মানুষজন খুব ভালো কাজ করেছেন তাঁদের কথা জেনে লেখো :

তাঁদের নাম ও তাঁরা কী করতেন	কোথায় থাকতেন	কী কী ভালো কাজ করেছিলেন

২। তোমার এলাকায় কী কী বিশেষ সম্পদ তৈরি হয় সে বিষয়ে জেনে লেখো :

বিশেষ সম্পদের নাম	তার বৈশিষ্ট্য	কীভাবে তা তৈরি হয়

কেমন করে সমান ভাগ

বাড়িতে ফিরে ফুলমণি দেখল মৃগেনকাকু এসেছেন। কাকুদের গ্রামে যাওয়ার পথে দেখা মাঠের কথাটা ওর মনে পড়ল। সেটা নিয়েই

ফুলমণি গল্প শুরু করল। বন্ধুদের সঙ্গে এসব নিয়ে কত কথা হয়েছে তা কাকুকে বলল। স্যার কী কী বলেছেন সেকথাও বলল।

কাকু সব শুনলেন। তারপর বললে— বনের গাছের পাতা আমাদের অক্সিজেন দেয়। বন আর পাহাড় আছে, তাই সারা রাজ্যে বৃষ্টি হয়। আমরা চাষের জল পাই। পাহাড় থেকে জল গড়িয়ে সমতলে যায়। তাই আমাদের নদী। গরমকালেও চাষ।

ফুলমণি বলল— বন ছাড়াও এদিকেই আছে কয়লা, আরও কত খনিজ পদার্থ! কিন্তু ধান ভালো না হলে মুশকিল। খাবারের অভাব। জলের কষ্ট। এসব কষ্ট না মিটলে অন্য সম্পদ দিয়ে কী হবে?

— ঠিকই বলেছ। বন-পাহাড়ের আর সমতলের সম্পদ সবাইকে ভাগ করে নিতে হবে। এক অঞ্চলের উন্নতিতে অন্য অঞ্চলকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সবার মিলিত উন্নতি হবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকার কী কী সম্পদ অন্য কোথায় যায় বা অন্য এলাকার কী কী সম্পদ তোমার এলাকায় আসে সে বিষয়ে খোঁজ করে লেখো:

তোমার এলাকায় কী কী সম্পদ পাওয়া যায়	ওই সব সম্পদ কোথায় কোথায় যায়	তোমার এলাকায় কী কী পাওয়া যায় না	কোথা থেকে সেসব তোমার অঞ্চলে আসে

আমাদের কৃষিজ সম্পদ : ধান

জুলাইয়ের মাঝামাঝি। কদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। সমীরদের গ্রামে মাঠে মাঠে পাওয়ার টিলারে চাষ হচ্ছে। সমীরের বাবা-কাকা সারাদিন মাঠে ব্যস্ত। পাওয়ার টিলার দিয়ে লোকের জমিতে চাষ করে বেড়াচ্ছেন। দিদি আর সমীর টিফিন কৌটোয় করে ভাত নিয়ে গেল মাঠে।

কোনো জমিতে চাষ হয়ে গেছে। ধান রোয়া হয়ে গেছে। কোথাও আবার পাওয়ার টিলার চলছে।

খানিক পরে বাড়ি ফিরল ওরা। ঠাকুমাকে সামনে পেয়ে

সমীর বলল— এবারও ধানকাটার সময় সেই বড়ো মেশিনটা আনবে?

ঠাকুমা হাসতে হাসতে বললেন— এখন তো জমিচষা আর ধান রোয়ার কাজ। ধান হবে, তবে তো কাটা-ঝাড়া?

পরদিন স্কুলেও ওই মেশিনটার কথা উঠল। ছেলেমেয়েরা ধানকাটা মেশিন নিয়ে খুব কথা বলতে লাগল। তাদের কথা শেষ হলে দিদি বললেন— ওটা ধান কাটা-ঝাড়ার খুব আধুনিক যন্ত্র। ওটার নাম হারভেস্টার।

সুবীর নামটা বোঝেনি। তাই আর একবার জানতে চাইল নামটা। দিদি বললেন— ওটা দিয়ে কী করা হয়?

— ধান কাটা। খড় থেকে ধান আলাদা করা। এক জায়গায় জড়ো করা। সব এক মেশিনে হয়।

— এই কাজগুলোকে এক সঙ্গে ইংরাজিতে বলে হারভেস্টিং। তাই ওই যন্ত্রটার নাম হারভেস্টার।

তৃপ্তি বলল— যে চাষ করে তাকে তো ইংরাজিতে টিলার বলে। তাহলে জমিচষার যন্ত্রকে পাওয়ার টিলার বলে কেন?

আকবর বলল— পাওয়ার মানে কী? ক্ষমতা। বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে যে, তার ক্ষমতা বেশি। পাওয়ার টিলার তাড়াতাড়ি জমি চষে।

দিদি হেসে বললেন— এই তো বেশ বলেছ।

কেয়া বলল— জানেন দিদি, সমীরের ঠাকুমা গাঁয়ে প্রথম পাওয়ার টিলার এনেছিলেন। আবার গত বছর হারভেস্টার আনালেন।

মানুষে টানা লাঙল

দিদি কেয়ার কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন— তার মানে?

এবার সমীর নিজেই বলল— ঠাকুরদা যখন মারা যান তখন বাবার বয়স আমার মতো। ঠাকুমা ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে পাওয়ার টিলার কিনেছিলেন।

—আর হারভেস্টারের ব্যাপারটা?

— ঠাকুমা বোধহয় কাগজে ওটার ছবি দেখেছিলন। তারপর মোবাইলে কথা বলে সব ঠিক করলেন। শহর থেকে বাবা ওটা ভাড়া করে আনলেন। গতবার এখানে অনেকের ধান কাটা-ঝাড়া হলো।

—শহর থেকে তো ভাড়া করেই আনলেন। তাতে তোমাদের কী লাভ হলো?

সমীরের আগেই কেয়া উত্তর দিল— আনলেন তো মাসিক ভাড়ায়। এখানে ঘন্টা হিসাবে ভাড়ায় খাটালেন মেশিন। ওর ঠাকুমার খুব বুদ্ধি!

দিদিমণি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন— চাষের কাজ কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধিতেই শুরু হয়েছিল। পুরুষরা শিকার করত। বনের ফল-পাতা আনতে যেত। ঘর সামলাত মেয়েরা। তার মধ্যেই তারা দেখল কীভাবে বীজ থেকে গাছ হয়। ভাবল, তাহলে গাছ লাগিয়ে যত্ন করে বড়ো করি। তা থেকে খাওয়ার শস্য পাওয়া যাবে।

— তারপর কী হলো?

— সহজে খাবার শস্য পাওয়া গেল। তারপর দেখা গেল ভালো করে মাটি খুঁড়ে চাষ করলে বেশি শস্য হয়। তারপর হলো কাঠের লাঙল। মানুষই চেপে ধরত। অন্য একজন টানত। তারপর এক সময় মানুষ বুঝল যে গোরু, মহিষ, ঘোড়াদের দিয়ে কাজটা করানো যাবে। তাদের খড় খাইয়ে রাখা যাবে। নিজেরা শস্য পাবে।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

নানা যুগে চাষের নানা কাজে যন্ত্রপাতি, মানুষ ও পশুর নানারকম ভূমিকা ছিল। এবিষয়ে বড়োদের কাছ থেকে জেনে ও নিজেরা আলোচনা করে লেখো:

কাজ	অনেক কাল আগে	ঠাকুমা-দিদিমাদের যুগে	ইদানীং কালে
মাটি আলগা করা			
মাটি সমান করা			
বীজ বা চারা বোনা			
ঘাস ও আগাছা তোলা			
ফসল তোলা			
ফসল খাবার মতো করা			

সার আর কীটনাশক

কাঠের লাঙল। মানুষই চেপে ধরত। অন্য একজন টানত। অবাক হওয়ার কথা। তবে অবিশ্বাস করল না কেউ। প্রথমেই কী করে গোরুকে কাজে লাগাবে? কোন জন্তু পোষ মানবে তা বুঝতে তো সময় লাগবেই!

ইমরান বলল— আচ্ছা, তখন সার দিত জমিতে? আর পোকা মারার বিষও কি দিত?

দীপা বলল— গোবর সার হয়তো ছিল।

— গোবর দিলে যে ফলন বাড়বে তা কী করে জানবে?

— গোরু দিয়ে লাঙল টানাতে গিয়েই বুঝে থাকবে। হয়তো গোরুরা কোথাও বিশ্রাম নিত। পরে সেখানে চাষ করা হলো। খুব ভালো ফলন হলো। তাতেই লোকে বুঝল

গোবর থেকে সার হবে! তবে প্রথমদিকে কোনো সারের ব্যবহারই হতো না।

দিদিকে এসব ভাবনার কথা বলল সবাই মিলে। দিদি বললেন --- এমন তো হতেই পারে। তবে অন্য অনেকরকমও হতে পারে। আসলে নানা জায়গায় নানারকম হয়েছিল।

এই কথাটা বুঝতে পারল না কেয়া। বলল--- নানা জায়গায় নানারকম মানে?

— ধরো, এটা একটা নদীর ধার। এখানে দু-চারশো লোক থাকে। তারা সবদিকে দুই-তিন কিলোমিটার জায়গার জঙ্গল কেটে চাষ করে। তারপর বন। আর কোথাও মানুষ আছে তা তারা জানে না।

— বুঝেছি। হয়তো কুড়ি-তিরিশ কিলোমিটার বনের পরে আর এক দল মানুষ আছে। তারাও ওই রকম খানিকটা জায়গায় চাষ করে। কিন্তু অন্যরা কী করে তা জানে না।

দীপা বলল— হয়তো একদল মানুষ অনেক কিছু শিখে

গেল। অন্যরা কিছুই শিখল না। এমনও তো হতে পারে।

— ঠিক তাই। প্রথম যুগে একই বিষয় নানাভাবে শিখেছে মানুষ। সার, কীটনাশকের ব্যবহারের বিষয়েও কথাটা সত্যি।

— কী কীটনাশক ছিল তখন?

— সেগুলোই তো ফিরে আসছে। আগে কীটনাশক হিসাবে নিমপাতা ব্যবহার করা হতো।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের কাছাকাছি এলাকায় নানা সময়ে চাষের জন্য কী সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে তা বড়োদের কাছে জেনে ও নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

চাষে ব্যবহৃত	অনেক কাল আগে	ঠাকুমা-দিদিমাদের যুগে	ইদানীং কালে
সার			
কীটনাশক			

চালের দাম চার গুণ

বড়োদের জিজ্ঞেস করে সবাই অনেক কিছু জানল। ৪০-৪৫ বছর আগে এখানে রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের ব্যবহার বাড়া শুরু হয়। ২০-২৫ বছর আগে পর্যন্ত তা খুব বাড়ছিল। তারপর আর অত বাড়ছিল না। ইদানীং সেটা হয়তো কমতে শুরু করেছে। এখন নাকি বেশি সার দিয়েও ফলন বাড়ছে না। অনেকেই জৈব সারের দিকে ঝুঁকেছেন। প্রাকৃতিক কীটনাশক খুঁজছেন। শুধু রাসায়নিক সার দিলে ভবিষ্যতে জমি নাকি মোটে

ফসল দেবে না। বেশি রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করলে জমির বন্ধু-পোকারাও মরে যাবে। মৌমাছি, প্রজাপতি, রেশমপোকার মতো অর্থকরী পোকারাও হারিয়ে যাবে।

কিন্তু সার আর কীটনাশক ব্যবহার অত বেড়েছিল কেন? তা নিয়ে মতিনের নানি বললেন—১৯৬৬ সাল। আমরা তখন ছোটো। দু-বছরে চালের দাম চার গুণ হয়ে গেল। এক টাকা চার আনা থেকে পাঁচ টাকা! টাকা দিলেও চাল পাওয়া যায় না। যাবে কী করে? ফসল কম। লোক বেশি। বছর কয়েক এমন চলল। এক জায়গার চাল অন্য জায়গায় যাবে না। ভাত নেই। র‍্যাশনের যব-মাইলো আর ভুট্টা খাও। আমাদের কী ভাত না হলে ভালো লাগে!

তারপর নতুন বীজ এল। নতুন নতুন সার। পোকা মারার নতুন নতুন বিষ। ডিপটিউবওয়েল বসল। গরমের সময় ধানচাষ শুরু হলো। ছোটো ছোটো ধান গাছ। তিন-চার মাসে ধান পেকে যায়। ফলনও বেশি। বছরে দুই-তিন

বার ধানচাষ হলো। এভাবে চার-পাঁচ বছর চলার পর চালের আকাল কাটল।

দিদিকে এসব বলল সবাই। দিদি বললেন---

সার-কীটনাশক ব্যবহার কীভাবে বাড়ল তা তো শুনেছ। কিছু কিছু অব্যবহৃত জমিও কাজে লাগানো শুরু হলো। এভাবে আমরা মোটামুটিভাবে নিজেদের দরকার মতো খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে পারলাম। এই ঘটনাকে ভারতের *সবুজ বিপ্লব* বলা হয়। ১৯৯০ সালের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত খাদ্যের উৎপাদনও বাড়তে থাকে। তারপর তাড়াহুড়ো করে উৎপাদন বাড়ানোর কুফল বোঝা শুরু হয়।

মীনা বলল— বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা কমে যায়!

বিকাশ বলল— রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করলেও জমির ক্ষতি হয়।

— হ্যাঁ, মাটির নীচের জল তোলার সমস্যাও ফুটে উঠল। অনেক ডিপটিউবওয়েল থেকে জল ওঠা বন্ধ হয়ে গেল।

সাহেব বলল — আমাদের পাড়ায় ডিপটিউবওয়েলটা চলেই না।

— তাই নতুন ভাবনা এল। জৈব সার, অণুজীব সার। জৈব কীটনাশকের ব্যবহার। নানা ধরনের বীজ ব্যবহার। বৃষ্টির জল জমিয়ে রেখে পরে ব্যবহার করা। এভাবে কৃষি উৎপাদন অল্প করে বাড়ালেও ভালো। কারণ তা টেকসই হবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের এলাকায় বিভিন্ন ঋতুতে চাষে জলের ব্যবহার নিয়ে কী দেখেছ। আলোচনা করো। তারপর লেখো :

ঋতু	চাষের ফসল	জলের উৎস	জল দেওয়ার ব্যবস্থা

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

লোহার ফলা লাগানো লাঙল টানত গোরু। এভাবেই চাষ হতো বছর পঞ্চাশ আগে পর্যন্ত। চাষের জল তখন

শুধু বৃষ্টি থেকে। বৃষ্টি হতো কমবেশি এখনকার মতোই। বর্ষাকালে ধানচাষ হতো। আনাজ চাষে জল কম লাগে। শীতকালে ডাল, কপি, পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদি হতো। গরমের সময়ে ঝিঙে, পটল, ঢ্যাঁড়শ হতো। নদী, খাল, পুকুরে জমে থাকত কিছু জল। ডোঙায় করে সেই জল খেতে দেওয়া হতো। কিছু জমিতে আখ চাষ হতো। চাষে জৈব সার ব্যবহার করা হতো। তবে কীটনাশকের ব্যবহার হতো না বললেই চলে।

দু-রকম ধানচাষ হতো। আউস আর আমন। আউসে একটু কম জল লাগে। আউস ধানের গাছ একটু ছোটো। একটু

উঁচু জমিতে আউস ধানের চাষ। তুলনায় নীচু জমিতে আমন ধানের চাষ। আমনের গাছ বড়ো। আমন ধানের মধ্যে কিছু মোটা ধান ছিল। সেগুলোর গাছ খুব লম্বা হতো।

চেরা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হতো ফাঁকাফাঁকা একটা ধান-ঝাড়ন। ধান সমেত খড় তার উপর পেটানো হতো। তাতে ধান আর খড় আলাদা হতো। এই কাজটাকে বলা হতো ধানঝাড়া।

খড় জড়িয়ে মোটা দড়ি করা যায়। বাঁশের কাঠামোর উপর ওইরকম দড়ি জড়িয়ে ঘর করা যায়। এভাবে তৈরি হতো ধান রাখার গোলা। খড়ের ছাউনি থাকত গোলায়।

বেশিরভাগ জমিতে ধান চাষ একবারই হতো। কিছু ক্ষেত্রে আগে আউস ধান চাষ করে নেওয়া হতো। তারপর আমন ধান চাষও হতো। কিছু জমিতে গ্রীষ্মে পাট চাষ করা হতো। পাট উঠে গেলে তারপর আমন ধান চাষ করা হতো।

পাহাড়ি অঞ্চলে সিঁড়ির মতো জমি তৈরি করে চাষ হতো। ওইভাবে চাষ করাকে বলে ধাপ-চাষ। তবে ধানের চাষ কম হতো। নানা রকমের শাক-আনাজ, গম, ভুট্টা, আলু হতো। দার্জিলিং-এর উঁচু ও ঢালু জমিতে বন কেটে অনেক চা বাগান গড়ে উঠেছিল।

ঢালু কাঁকুরে মাটিতে বর্ষাকালে আউস ধান হতো। এছাড়া ডাল, ভুট্টা, বাদাম ইত্যাদিরও চাষ হতো।

বলাবলি করে লেখো

বিভিন্ন ঋতুতে তোমার এলাকার কৃষি উৎপাদন বিষয়ে নানা জনের সঙ্গে কথা বলে নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

কী জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্য	উৎপন্ন দ্রব্যের নাম	কোন ঋতুতে উৎপন্ন হয়
দানাশস্য জাতীয়		
ডাল / আনাজ জাতীয়		
ফুল		
ফল		
অন্যান্য		

ওরে বৃষ্টি দূরে যা

স্বপ্নার কাকা দার্জিলিং জেলার একটা চা বাগানে কাজ করেন। দু-বছর পর হাওড়ার বাড়িতে ফিরেছেন। স্বপ্নারা ঘিরে ধরল, ওখানকার কথা বলতে হবে।

কাকা বললেন— ওখানে খুব বৃষ্টি। সারা বছর মিলে এখানকার দ্বিগুণ হবে। কিন্তু জল দাঁড়ায় না। পাহাড়ের ঢাল তো, জল নেমে যায়।

আব্দুল বলল— চাষ হয় কীভাবে?

আকাশ বলল— ভুলে গেলি? ধাপ-চাষ হয়।

কাকা বললেন— তা ঠিক। তবে ধান খুব বেশি হয় না। গম, ভুট্টা, আলু, আদা, সয়াবিন চাষ হয়।

— ওখানে একরকম লতানো গাছ আছে। ঝিঙে গাছের মতো দেখতে। ফলটা আবার খেতে অনেকটা পেঁপের মতো। তাকে বলে স্কোয়াশ।

— এছাড়া মাঝে মাঝে কমলালেবুর বাগান আছে। আর চা বাগান আছে। চা ওখানকার প্রধান ফসল।

স্কুলে দিদিকে এসব কথা বলল ওরা। দিদি বললেন - ওখানে সারা বছর আবহাওয়াও ঠান্ডা। তাই আমাদের যখন গরম কাল তখন ওখানে শীতের সবজি হয়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং, মুলো সবই ফলে।

স্বপ্না বলল— অত যে বৃষ্টি, জলটা যায় কোথায়?

রফিকুল বলল— মনে নেই? ওই অঞ্চলে তিস্তা আর মহানন্দা আছে। নদী দিয়ে জল নেমে যায় তরাই অঞ্চলে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকায় ফসলের উৎপাদন কিংবা ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে বড়োদের কাছে জেনে ও আলোচনা করে লেখো :

কী কী ফসল উৎপন্ন হয়	ফসল কত দামে বিক্রি হয়	ওই ফসল কীধরনের ব্যবহার হয়	কোন ঋতুতে কোন ফসল বেশি

তরাই আর মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষি

ইমরান বুঝল, তিস্তা-মহানন্দার পলি জমে তরাই অঞ্চলের মাটি উর্বর হয়ে গেছে। ভালো ফসল হয়। বলল --- কোন কোন ফসলের চাষ বেশি হয়?

--- ধান হয় প্রচুর। পাট, গম, বাদাম হয়। নানারকম সবজিও হয়।। আর তরাইয়ের ঢালের দিকে চা হয় প্রচুর।

— চা পর্বতে হয়, আবার তরাইয়েও হয় ?

— তরাইয়ের একটা বিরাট অঞ্চল পর্বতের পাদদেশে।

সমতল পর্যন্ত ঢালু জমি। সেখানে জল দাঁড়ায় না। খুব গরমও নয়। এই আবহাওয়ায় চা ভালো হয়।

— এখানেই কি চা বেশি ভালো হয়?

আকাশ এবিষয়ে অনেক জানে। বলল— নারে। দার্জিলিং চায়ের স্বাদ-গন্ধ আলাদা। বোধহয় ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ওই গন্ধ হয়। অনেক দামে নানা দেশে বিক্রি হয়।

— তরাইয়ে ফল কেমন হয়?

— জুলাই মাসে তরাইয়ের আনারস দেখিসনি? তরাই-এর আনারস আর কলা খুব বিখ্যাত।

জিনা বলল— ওখানে বৃষ্টি কেমন?

— উত্তরেরপর্বতের চেয়ে কম। তবে দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে বেশি। দুয়ের মাঝামাঝি। এই জল নদী দিয়ে দক্ষিণে বয়ে যায়।

— মালদা আর দক্ষিণ দিনাজপুরে এই জলে চাষ হয়?

— কিছু অঞ্চলে হয়। ধান, পাট ছাড়াও আখ হয়।

শাক-সবজি, আম, লিচুও ফলে। ফজলি আমের কথা তো জানোই।

— ওই অঞ্চলেই তো রেশম কীট পালনের জন্য তুঁত গাছের চাষ হয়, তাই না?

— এই অঞ্চলেই। অনেক তুঁত ঝোপ আছে। তুঁত গাছ লাগানোও হয়। এটা এখানকার অনুর্বর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ চাষ।

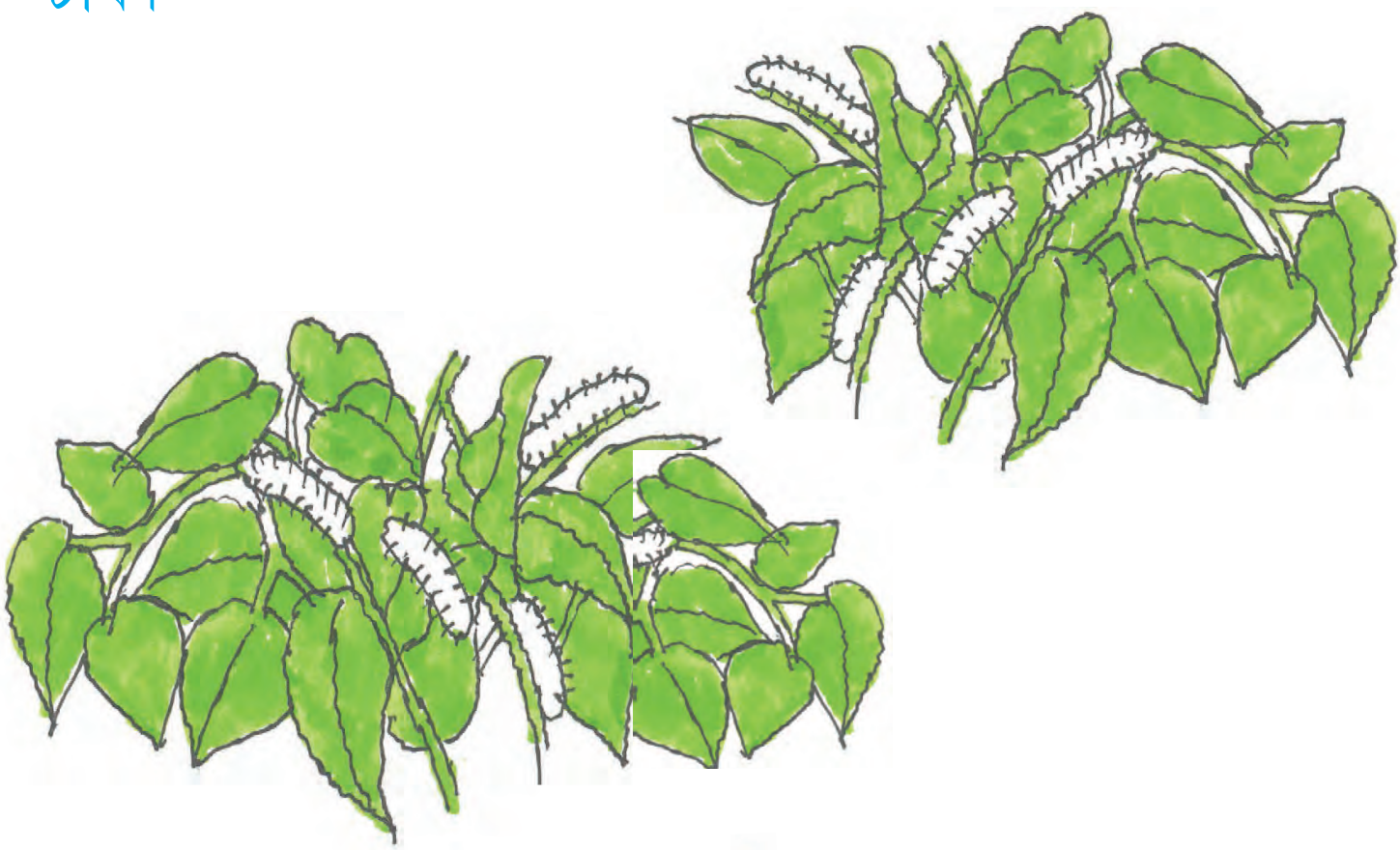

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে অনুর্বর জমিতে কী কী চাষ হয় ? নীচে লেখো :

জায়গার নাম ইত্যাদি	কী চাষ করা দেখেছ	গাছগুলো কেমন (বড়ো/ছোটো/ লতানো)	কত দিন পরে ফসল হয়েছে

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ আর রাঢ় অঞ্চলের কৃষি

ইছামতির পাশে অশেষদের বাড়ি। আবার রূপনারায়ণের কাছে তার মামার বাড়ি। অশেষ ভাগিরথীর দু-দিকের কৃষির কথাই অনেকটা জানে। ক্লাসে সে বলল

— দু-দিকেই বৃষ্টি প্রায় সমান। পুবদিকের পুরোটা একেবারে সমতল। পশ্চিমদিকেরও, দামোদরের কাছের অঞ্চলটা পুরো সমতলই।

আসিফ বলল— ওদিকেই তো খুব আলু হয়?

— হ্যাঁ। শীতকালে যাবি। দামোদরের দুই পাশের জমিতে আলু আর আলু। যেদিকে তাকাবি ছোটো ছেটো সবুজ আলু গাছ। চোখ জুড়িয়ে যাবে।

আকাশ বলল— উত্তরে চা বাগানগুলো ওইরকম। ছোটো ছোটো সবুজ চা গাছ।

এর মধ্যে দিদি এসেছেন। ওরা কেউ দেখেনি। দিদি হাসতে হাসতে বললেন— আলু গাছ চা গাছের চেয়েও ছোটো। আর আলু হয় মাটির নীচে। আলুর পাতা দিয়ে জমির সার হয়। চায়ের মতো কিছু হয় না!

অশেষ বলল— আলু খেতের পাশে পাশে সাথি ফসল সরষে। সরষের হলুদ ফুল। হলুদ মালায় ঘেরা সবুজ খেত!

তিয়ান বলল— ধানের কথা বললি না তো?

অশেষ বলল— এই দুই অঞ্চলেই খুব ধান হয়। আমন ধানের চাষ এখন খুব কম হয়। উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বেশি।

— দুর্গাপুরের পূর্ব থেকেই বর্ধমান জেলার মাটি ধানের পক্ষে খুব ভালো।

— কিন্তু হুগলির পশ্চিম দিকে আর হাওড়ার পূর্ব দিকটায় খুব বন্যা হয়। ডিভিসি জল ছাড়ে। অনেক জায়গায় বর্ষায় ধান নষ্ট হয়ে যায়।

— ডিভিসি-র পুরো কথাটার মানে জানো? ডি ভি সি-র

পুরো কথাটার মানে হলো দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। বন্যা বন্ধ করার জন্যই ডিভিসি করা হয়েছিল। ঠিক ছিল,পাহাড় থেকে দামোদর নদী দিয়ে গড়িয়ে আসা বর্ষার জল জমিয়ে রাখা হবে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের কাছেই অনেকগুলো জলাধার করা হবে। সেখানে জল আটকে রাখা হবে। তাতে বন্যা হতে পারবে না। পরে সেই জল অল্প অল্প করে ছাড়া হবে। তাতে এই অঞ্চল সারা বছর চাষ করার জল পাবে।

— কিন্তু তাতে তো বন্যা বন্দ হয়নি। ডিভিসি জল ছাড়ে। আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই জল চলে আসে। খুব বন্যা হয়।

— যতগুলো জলাধার করার কথা ছিল, ততগুলো করা সম্ভব হয়নি। তাই বর্ষার জল পুরোটা আটকে রাখা যায় না। ফলে বর্ষাকালেই অনেক জল ছাড়তে হয়। বন্যা হয়। পরেও চাষের জন্য যথেষ্ট জল পাওয়া যায় না।

ফসল মানচিত্র

সবিতা জানতে চাইল--- এইসব অঞ্চলে শাকসবজি চাষ কেমন হয়?

অশেষ বলল— হয় দু-দিকেই। তবে কিছুটা কম-বেশি আছে। গঙ্গার পুব দিকে সব জায়গাতেই অনেক সবজি চাষ। পশ্চিম দিকেও কয়েক কিলোমিটার খুব সবজি চাষ হয়। দামোদর আর মুণ্ডেশ্বরীর দু-পাশেও প্রচুর সবজি হয়। সরষে ও তিল চাষও হয়। তবে ওদিকটায় নদী থেকে দূরে গেলে সবজি চাষ একটু কম।

— সবজি খেতগুলো দেখতেও খুব সুন্দর হয়।

--- পাশাপাশি অনেকরকম থাকে তো। ঝিঙে-পটল-বেগুন-ঢ্যাঁড়শ থাকে। নানা রঙের ফুল।

ফসলের নাম	চিহ্ন
ঝিঙে	
পটল	
বেগুন	
ঢ্যাঁড়শ	
ধান	
পাট	
সরষে	
চিচিঙ্গা/হোপা	
কলমি শাক	
তিল	
লাউ	
কুমড়ো	
ফাঁকা জমি	

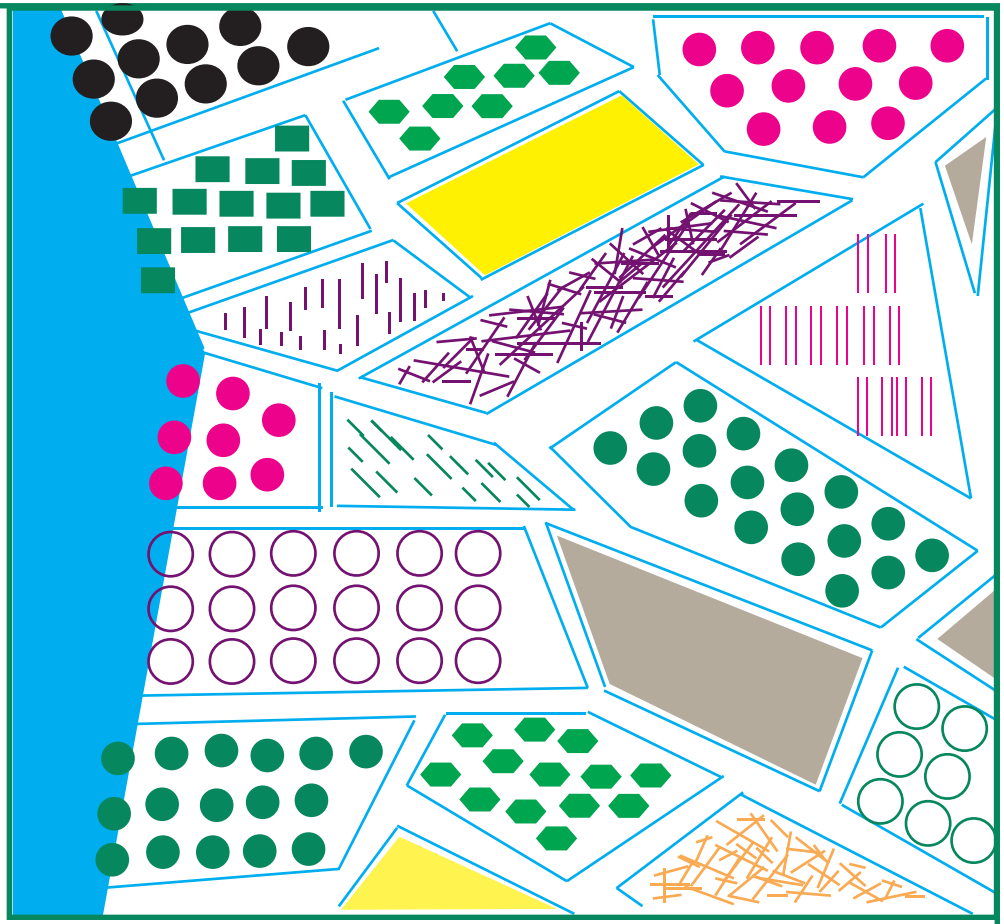

ধান-পাটও থাকে। দেখতে সুন্দর লাগে। আমাদের বাড়ির পিছনে তো চাষের খেত। একদিন গুনে দেখি বারোরকম জিনিসের চাষ হয়েছে। আমি খেতটার একটা মানচিত্রও এঁকেছি। সেটাই এখন দেখ। একদিন যাবি। ওই খেতটা দেখে আসবি।

এবারে অশেষ ওদের বাড়ির পিছনের খেতের ফসলের মানচিত্র দেখাল।

তারপর বলল — অনেকজনের জমি। যার যা খুশি চাষ করেন।

— শীতকালেও অনেক সবজি চাষ হয়?

— সে তো হবেই। খেতের কিছু গাছ সারা বছরের। যেমন পেঁপে। সেগুলো রয়ে যায়। অন্যগুলো তো পাঁচ-ছ-মাসের গাছ। সেগুলো মরে গেলে আবার শীতকালের শাক-সবজি লাগানো হয়।

তোমাদের কাছাকাছি অঞ্চলের একটা খেতের শীতকালের ফসল মানচিত্র আঁকো:

পানের চাষ, ফুলের চাষ

ইতু জানতে চাইল— এইসব অঞ্চলে ফল হয়? ফলের বাগান আছে?

দিদিমণি বললেন--- পশ্চিম দিকটায় একটু কম হয়। তবে দু-দিকেই এখন অনেক জায়গায় ফলের বাগান হয়েছে। আমবাগান, কলাবাগান। কোথাও আবার একই বাগানে আম, লিচু, বাতাবি, কাঁঠাল সব গাছ হয়।

অশেষ বলল --- গঙ্গার পূর্ব দিকের মতো আমবাগান পশ্চিম দিকে দেখিনি।

— ঠিকই বলেছ। মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর-চব্বিশ পরগনার মতো আমবাগান অন্যত্র নেই।

— ফুটি, তরমুজ হয়? পান, সুপারি, নারকেল?

— সব জায়গায় হয়। বেশি পলির উপর বেশি ভালো হয়। দক্ষিণের দিকে নারকেল, সুপারি বেশি হয়।

— নানারকম ফুল?

— অনেক জায়গায় হয়। তবে শহরে তো ফুলের বাজার। তাই শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে ফুলের চাষ বেশি হয়।

বলাবলি করে লেখো

কী কী চাষ করা দেখেছ? সে বিষয়ে লেখো :

জায়গার নাম	ফসল/ ফুল/ ফলের নাম	গাছগুলো কত উঁচু হয়	গাছ লাগানোর কতদিন পরে ফসল/ফুল/ফল হয়	কী কী সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে

পশ্চিমের পাহাড়ি লালমাটির কৃষি

দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম সীমা বরাবর কাঁকুরে লালমাটির অঞ্চল। এখানে বৃষ্টি কম হয়। বৃষ্টির জল গড়িয়ে পূর্ব-দক্ষিণে চলেও যায়।

মটর, অড়হর, মুসুর, বিউলি, বরবটি, সিম ইত্যাদি চাষে জল কম লাগে। ভুট্টার মতো শস্য ও বাদাম চাষেও তাই। এখানে প্রধানত ওইসবের চাষ হয়। তাছাড়া আতা, মুসাম্বি লেবু, আম, বেল ইত্যাদি ফল ভালো হয়। শাক-সবজি চাষও হয়।

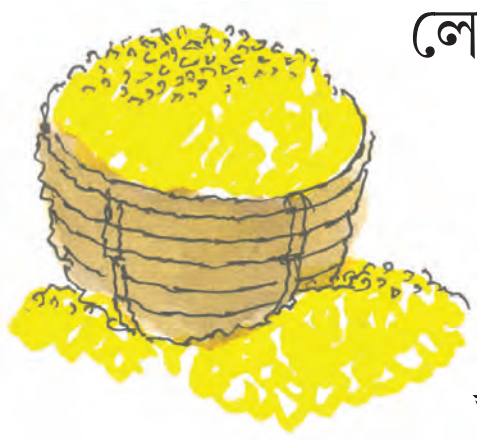

আগে ধান চাষ হতো খুব কম। আজকাল ধান চাষ কিছুটা বেড়েছে।

মানুষ উঁচু জায়গার মাটি কেটে ঢালের দিকে ফেলছে। এভাবে ছোটো ছোটো চাষের জমি হচ্ছে। তারপর চারপাশে আল দিলে বর্ষার জল আটকে যাচ্ছে।

ওই জমিতে বর্ষাকালে উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষ হচ্ছে।

ক্লাসে এসে দিদিমণি নিজেই এসব বলে দিলেন। শুনে আকাশ বলল— উত্তরের পর্বতেও এইভাবে চাষের জমি বানায়।

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ। পদ্ধতিটা একই। তবে সেখানে ভূমির ঢাল অনেক বেশি। তাই চাষের জমিগুলো আরও ছোটো হয়। সেখানে বৃষ্টি অনেক বেশি হয়। তবে দু-জায়গাতেই চাষ করতে অনেক সার লাগে।

বলাবলি করে লেখো

ধান, মটর, অড়হর, বরবটি, সিম, ভুট্টা, বাদাম, আতা, বেল— এগুলোর কোন অংশ আমরা খাই? খাদ্য অংশগুলোর নাম লেখো। খাতায় তাদের ছবি আঁকো। গাছের বাকি অংশের কী ব্যবহার হয় তা লেখো :

গাছের নাম	খাদ্য অংশের নাম ও ছবি	গাছের বাকি অংশের ব্যবহার	গাছের নাম	খাদ্য অংশের নাম ও ছবি	গাছের বাকি অংশের ব্যবহার

দক্ষিণের নোনা জমির কৃষি ও মাছ চাষ

সমুদ্রের খুব কাছের মাটিতে নুন বেশি। কৃষির পক্ষে ভালো নয়। এই অঞ্চলের কথা আবির অনেক জানে।

সে বলল — এই অঞ্চলে কিন্তু বেশ বৃষ্টি হয়।পাশের সমতল অঞ্চলের চেয়েও একটু বেশি। ধান চাষও হয়।

স্যার বললেন— আগে দেশি আমন ধান চাষ হতো। মোটা ধান, লম্বা খড়। জমিতে জল জমে থাকলে এই ধরনের ধান চাষ করার সুবিধা হয়। তবে এই ধানের বিঘা প্রতি ফলন একটু কম। এখন কয়েকটা উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বেশি হয়।

আবির বলল —এদিকে খুব নারকেল হয়। অন্য ফলের গাছও আছে। সবেদা হয়। বারুইপুরের পেয়ারা বিখ্যাত।

— তরমুজ আর পানও বিখ্যাত। এই অঞ্চলে লঙ্কা, সূর্যমুখী, ভুট্টা, খেসারি –এসবের চাষও হয়। শাক-সবজি যথেষ্টই হয়। দিঘার দিকটায় খুব কাজুবাদাম চাষ হয়।

ফতেমা বলল— এখানকার অনেক লোক জমিতে চাষ করেন না। ভেড়ি করেন। ভেড়িতে জল আটকে মাছ চাষ করেন।

আবির বলল— ভেড়ির মাছ খেতে ভালো। পারসে, ট্যাংরা, ভেটকি, পাবদা — নানারকম মাছ। বাগদা, গলদা– কতরকম চিংড়ি ! রুই, মৃগেল, কাতলা, সরপুঁটিও হয়।

— এই অঞ্চলের বহু মানুষ সমুদ্রেও মাছ ধরেন। নৌকা করে সমুদ্রে চলে যান। মাছ ধরতে যাওয়ার ট্রলারও আছে। সার্ডিন, ইলিশ, নানারকম চাঁদা, ভোলা, লোটে – এইসব মাছ ধরেন।

তৃষার মামার বাড়ি হলদিয়ার কাছে। সে বলল – হলদিয়া, দিঘাতেও অনেকে সমুদ্রে মাছ ধরতে যান।

— ঠিক বলেছ। ওগুলোও বঙ্গোপসাগরের উপকূল। উপকূলের সব জায়গা থেকেই মানুষ সমুদ্রে মাছ ধরতে যান।

এসো মাছ দেখি, চিনি আর লিখি :

চিতল

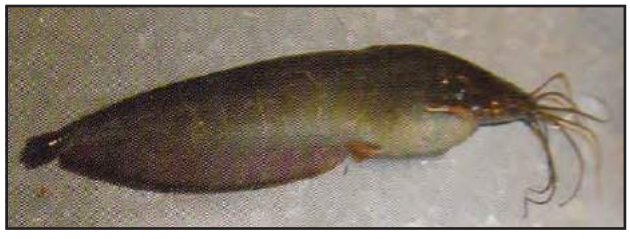

শিঙি

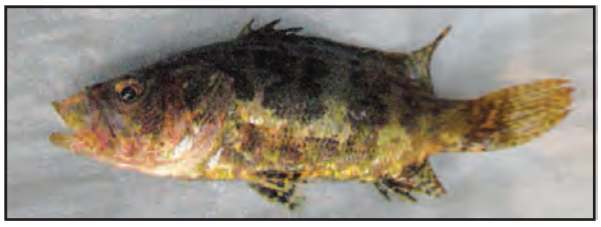

ন্যাদোশ

বাঙেগাশ

চেলা

অনেকরকম মাছ

অ্যালিসরা বাজার থেকে মাছ কেনে। ও ভাবত সব মাছ বুঝি পুকুরের। তাই ভেড়ির মাছের কথায় অবাক হয়ে গেল। বলল--- মাছ তো পুকুরে হয়!

রুবি বলল—পুকুরে তো হয়ই। নদীতে, খাল, বিলে, এমনকি নালা-নর্দমাতেও মাছ হয়। ধান খেতে জল জমে। সেখানেও মাছ হয়। মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। প্রবল বৃষ্টির পর দেখি পুকুরে পাশের মাঠ থেকে হু হু করে জল ঢুকছে। স্রোতের উলটো দিকে সাঁতরে মাছ চলে যাচ্ছে। দাদু বললেন, ওরা মাঠে চলে যাবে। আর ফিরতে পারবে না। হয় কেউ ধরে খাবে। নয় মরে যাবে।

স্যার বললেন— দাদু আর কিছু বলেননি?

— বললেন, রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ব্যবহার শুরু হওয়ার আগে এভাবে ধানখেত মাছে ভরে যেত। মৌরলা, পুঁটি, রুই, মৃগেল, কই, পাঁকাল, শিঙি, মাগুর, খলসে, ফলুই সবই চলে যেত। তবে বেশিদিন বেঁচে থাকত কই, চ্যাং, শিঙি, মাগুর, শোল, শালগুলো। ধানখেতেই তাদের বাচ্চারা বাড়ত। বাচ্চাগুলো খাওয়ার জন্য কোলাব্যাং, জলঢোঁড়া সাপ আসত। বৃষ্টি বেশি হলে ধান কাটার সময়ও জলকাদা থাকত। জিওল মাছ পাওয়া যেত।

— তুমি তো অনেক মাছের নাম বললে! ওসব মাছ চেনো?

— চ্যাং আর শাল দেখিনি। দাদু বলেছে, চ্যাং মাছ লেজে ভর দিয়ে খানিকটা লাফাতে পারে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকার মাছ সম্পর্কে লেখো :

যে মাছগুলো চেনা তাদের নাম	যে মাছগুলো খেয়েছ তাদের নাম	আর যে যে মাছ দেখেছ তাদের নাম

আরও অনেকরকম মাছ

অ্যালিস তিনরকম মাছের কথা জানত। ইলিশ, মাগুর আর পোনা। সে বলল - স্যার এতরকম মাছ হয়?

স্যার বললেন— তুমি তো অনেক মাছ খেয়েছ। রোজ কি খেতে একইরকম লাগে?

— তা হয় না। কোনোটায়

কাঁটা বেশি। কোনোটায় একটু অন্যরকম গন্ধ। কোনোটা খুব নরম।

— তার মানে কী? কেউ বলতে পারো?

রুবি বলল — কোনোদিন মৃগেল খায়। কোনোদিন কাতলা বা রুই। আবার কোনোদিন কালবোশ বা গুড়জালি।

— বাঃ! দাদুর কাছে অনেক শিখেছ তো!

এবার অ্যালিস বলল - স্যার, এখন থেকে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে বাজারে যাব। তারপর কবে কী মাছ খাচ্ছি তা লিখব! এভাবে শিখে নেব।

রুবি বলল — কিন্তু সরপুঁটি হয়তো আর খেতে পাবি না।

— এমন কথা কেন বলছ?

— সরপুঁটি তো খুব কমে গেছে। বাবা বলে, মাসে এক-দু-দিন পাওয়া যায়।

— ঠিকই। সরপুঁটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে।

— বাবা বলছিল, আগে ন্যাদোশ, খরশুলা মাছ খুব পাওয়া যেত।

— এগুলো সবই খুব কমে গেছে। তোমরা যখন আমাদের মতো বড়ো হবে, তখন হয়তো আর মোটে থাকবে না।

মনসুর বলল — কীভাবে এইসব মাছ টিকিয়ে রাখা যায়!

বলাবলি করে লেখো

কোন কোন মাছ আগে অনেক পাওয়া যেত, কিন্তু এখন খুব কমে গেছে। বাড়ি বা পাড়া বা মাছের বাজারে বয়স্কদের কাছে খোঁজ নাও। তারপর নিজেরা আলোচনা করো। তারপর লেখো।

খোঁজ নেওয়ার তারিখ	কোথায় খোঁজ নিয়েছ	কাদের কাছে খোঁজ নিয়েছ (নাম/সম্পর্ক)	বর্তমানে কমে যাওয়া মাছের নাম ও বর্ণনা (ছোটো/বড়ো/ আঁশহীন মাছ ইত্যাদি)	কত সাল থেকে খুব কমে গেছে

লুপ্তপ্রায় মাছ

সবাই বুঝল, খলসে, ন্যাদোশ, শোল, বোয়াল, কই-এর মতো মাছের কিছু প্রজাতি সংখ্যায় খুব কমে গেছে। সেসব মাছ হয়তো ভবিষ্যতে আর দেখাই যাবে না। স্বাদ জানা তো দূরের কথা!

দিদি বললেন — এগুলো লুপ্তপ্রায় মাছ। এদের ধরা বন্ধ করাই উচিত।

কিন্তু তার জন্য কী করা যায়? বাবররা ভাবল, প্রথমে সেসব মাছের একটা তালিকা করতে হবে। কোন মাছ কোথায় জন্মায় তা জানতে পারলে আরো ভালো। তারপর পঞ্চায়েতের প্রধানকে সব বলতে হবে। ওঁরা সেখানে একটা করে নিষেধাজ্ঞা বোর্ড ঝুলিয়ে দেবেন।

তর্পণ বলল— সমস্যা আছে। টাকা দিয়ে একজন পুকুর জমা নিল। রুই, কাতলা ধরনের মাছের খুব ছোটো পোনা

ফেলল। সারা বছর মাছদের খাবার দিল। তারপর জাল ফেলে রুই কাতলার সঙ্গে পেল দশটা ন্যাদোশ। সেগুলোরই দাম বেশি। সে মাছগুলো না ধরে জলে ছেড়ে দেবে?

খুব জটিল সমস্যা। সবাই ভাবতে লাগল। খানিক পরে বাবর বলল— অন্তত অর্ধেক ছাড়বে, এমন নিয়ম হোক।

অ্যালিস বলল — ছোটোগুলো ছাড়বে। ছোটোগুলোর তো ওজন কম।

তর্পণ বলল --- এটা হতে পারে। বাচ্চা ন্যাদোশ হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করা চলবে না। করলেই জরিমানা!

স্যার ক্লাসে আসার পর কর্মা সব কথা বলল। স্যার বললেন— এভাবে আলোচনা করো। সমাধান বেরিয়ে যাবে। তোমাদেরই বাড়ির বড়োরা পুকুর জমা নেন। মাছ চাষ করেন। তোমরা যেটা ন্যায্য ভাববে সেটা তাঁদের বলবে।

সোনাই বলল— মাছের কোন কোন প্রজাতি লুপ্তপ্রায় সেটা আগে জানতে হবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকায় মাছের প্রজাতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে লেখো :

একদমই দেখা যায় না এমন মাছের নাম	সংখ্যা খুব কমে গেছে এমন মাছের নাম	সারা বছর পাওয়া যায় না এমন মাছের নাম	সারা বছর পাওয়া যায় এমন মাছের নাম	আগে পাওয়া যেত না কিন্তু এখন পাওয়া যায় এমন মাছের নাম

লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচাও

স্কুল থেকে ফিরছিল মীরাতুন। পথে এহিয়াচাচার সঙ্গে দেখা। চাচা অনেক পুকুরে মাছ চাষ করেন। মীরাতুন লুপ্তপ্রায় মাছের কথা বলল। তাদের বাঁচানোর জন্য কী করার কথা ভাবছে তাও বলল।

সব শুনে চাচা বললেন — তাহলে তো আমাদের চাষের মাছের মুশকিল। শোল, শাল আর বোয়াল সব রুই-কাতলার পোনা খেয়ে শেষ করবে।

মীরাতুন বলল — তাই? তাহলে মৌরলাগুলো বাঁচাও। বড়ো ফাঁদির জাল ব্যবহার করে মাছ ধরো। মৌরলাগুলো যাতে ধরা না পড়ে!

— তা করা যায় কিনা ভাবতে হবে। মৌরলারও বাজারে দর অনেক।

মীরাতুন বুঝল লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচানোর সমস্যা অনেক!

পরদিন স্কুলে এসব কথা বলল। সবাই খুব চিন্তায় পড়ল। রতনদের মাছের চাষ আছে। সে মাছেদের কথা অনেক জানে। সে বলল — জলের মধ্যে গাছ থাকলে সেখানে কই, খলসে, ন্যাদোশ থাকে। বেলে, মাগুর, শিঙিদেরও সেখানে রাখা যায়। এদের জন্য আলাদা পুকুর রাখতে হবে। সেখানে মাছ চাষ করা যাবে না।

মীরাতুন বলল — পুকুরের মালিকরা কি তা শুনবেন?

রতন বলল --- যাঁর একটাই পুকুর তিনি হয়তো শুনবেন না। কিন্তু আমাদের অসুবিধে হবে না। আমাদের ছ-টা পুকুর। দাদু তো একটায় চাষ করেন না, দেশি মাছ হবে বলে।

— পঞ্চায়েত একটা-দুটো পুকুরে এভাবে দেশি মাছ সংরক্ষণ করতে পারে।

স্যার বললেন — তোমরা খুব ভেবেছ ব্যাপারটা। জলের পরিবেশ ঠিক রাখতে গেলে সব মাছকেই বাঁচানো দরকার। নইলে খাদ্যশৃঙ্খলটাই ভেঙে পড়বে।

বলাবলি করে লেখো

লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচানোর জন্য কে কী করতে পারেন আলোচনা করে লেখো :

যাঁরা মাছ চাষ করেন	
যাঁরা মাছ কেনেন	
পঞ্চায়েত ও পৌরসভা	
অন্যান্যরা	

মাছধরা

বড়ো ফাঁদির জাল কথাটা অ্যালিস বুঝতে পারেনি। ফেরার সময় মীরাতুনের কাছে বুঝে নিল। ফাঁদি মানে জালের সুতো দিয়ে তৈরি একটা খোপ। তারপর বলল— আচ্ছা, জাল কতরকম?

রতন বলল— জাল অনেকরকম। পুরো পুকুর ঘিরে ফেলার জাল। সব মাছ ধরতে গেলে লাগে। মাছ ঠিকঠাক বাড়ছে কিনা তা দেখতেও লাগে।

পরের দিন ক্লাসে কে কতরকম জাল দেখেছে সেই গল্প বলতে লাগল। স্যার বললেন— একই জালের কিন্তু নানা

জায়গায় নানারকম নাম আছে। জাল ছাড়া আর কী দিয়ে মাছ ধরে? বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি কিছু দেখোনি? স্রোতের মুখে পেতে রাখে।

আয়ুব বলল— বাক্সের মতো। মাছ ঢুকতে পারে, বেরোতে পারে না। আমরা বলি ঘুনি।

রুবি বলল — এছাড়া পোলো আছে। মাছের চারপাশ ঘিরে ফেলতে হয়। তারপর হাত ঢুকিয়ে ধরতে হয়।

উৎপল বলল— আমার ঠাকুরদার আবার ছিপ দিয়ে মাছধরার নেশা।

--- হ্যাঁ। মাছধরার নানারকম ব্যবস্থা করেছে মানুষ। কিছু কিছু অনেক আগে বানিয়েছে। কৃষিকাজ শেখার আগে থেকে মানুষ মাছ ধরছে। বয়স্কদের সঙ্গে কথা বললে

মাছধরার আরও অনেক কায়দা-কৌশল জানতে পারবে।

সবাই শুনল। আর ভাবতে লাগল। একটু পরে বিশ্বজিৎ বলল — স্যার, লুপ্তপ্রায় মাছ ধরতে দেওয়া ঠিক নয়।

আয়ুব বলল— অন্য লুপ্তপ্রায় প্রাণী শিকার করা নিষেধ! লুপ্তপ্রায় মাছ শিকারও নিষেধ করা উচিত।

— এটা তোমার মতামত। সবাই মিলে আলোচনা করো। তোমাদের সবার মিলিত মতই হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মত।

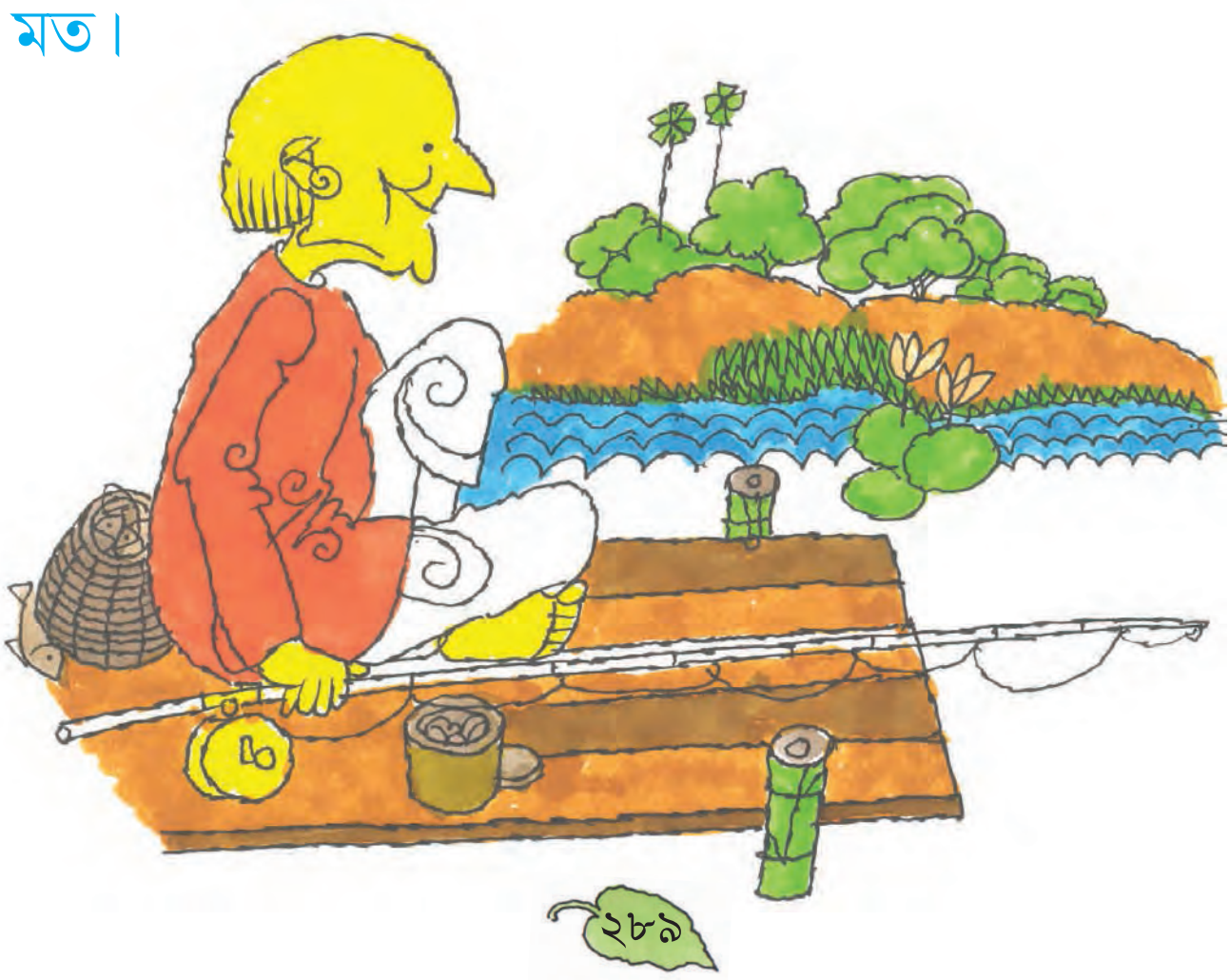

বলাবলি করে লেখো

কী কী জালের কথা জেনেছ? বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি কীসের কথা জেনেছ? নাম লেখো। ছবি আঁকো:

নাম	ছবি	নাম	ছবি

‘বনে থাকে বাঘ’

সত্যিই থাকে তো বাঘ? আর কে থাকে? আর কী থাকে?

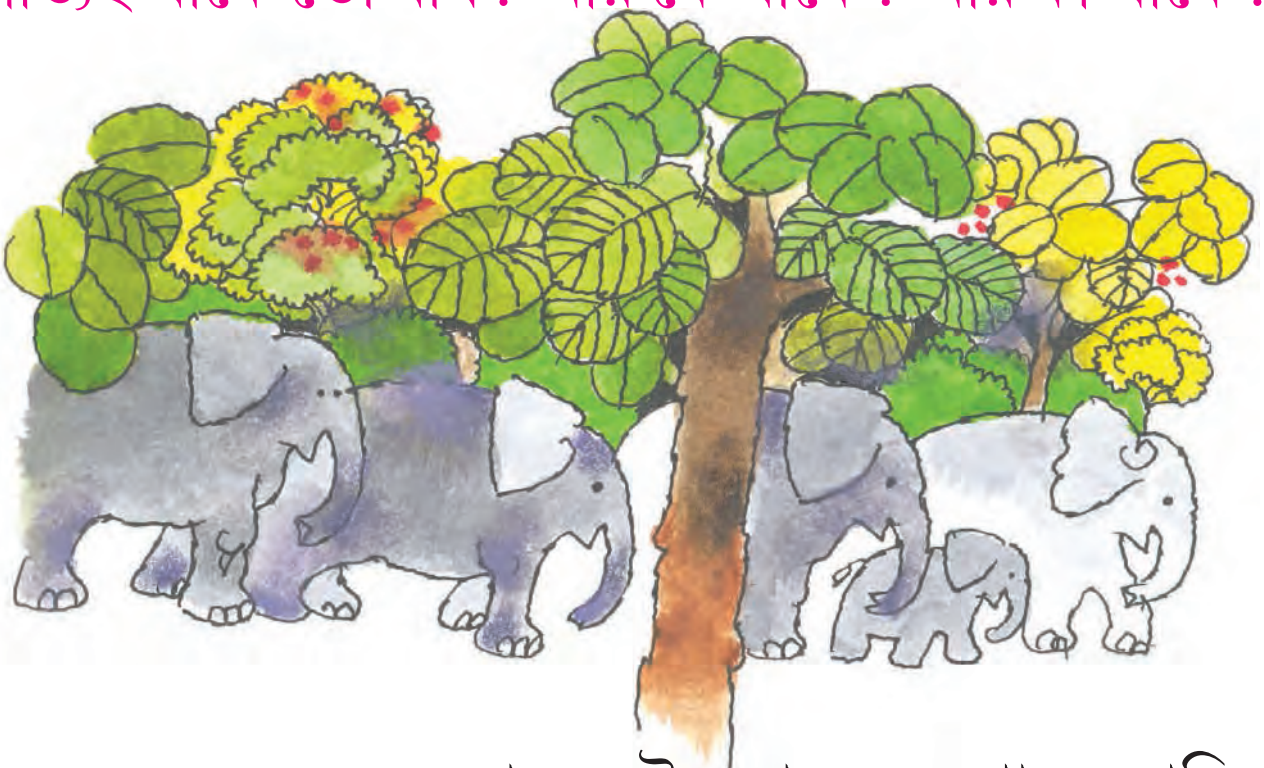

সুধন বলল— বনে বাঘ নেই তো! বনে থাকে হাতি। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে আমাদের ঘর-বাড়ি খেত নষ্ট করে দেয়। থাকে মৌমাছির দল। শিয়াল, খরগোশ। শাল, সেগুন, রাধাচূড়া, পলাশ, ইউক্যালিপটাস আরও কত গাছ।

ছবি বলল— কোথায় বাঘ? বনে তো পাইন গাছের সারি। আর ওক, ফার, বার্চ ও রডোডেনড্রন গাছ। ফার্ন আর

নানারকম ঝোপঝাড়। প্রজাপতি আর ঝরনা। চিতাবাঘ, কালো ভালুক, লাল পাণ্ডা ঘোরে।

মালতি বলল — বাঘ তো আছেই। মাঝে মাঝে বাড়ি ঘরে হানা দেয়। আর আছে সাপেরা। বুনোশুয়োর, বাঁদর, হরিণ, মেছোবিড়াল, ভোঁদড়ও আছে অনেক। আছে সুন্দরী, গরান, হেতাল গাছেরা। আর দু-পা যেতে নদী আর জলা। কুমির, কামটের ভয়ও আছে।

আক্রম বলল— আছে বাঘ। হাতি, বাইসন, একশৃঙ্গ গণ্ডার, চিতাবাঘ। চাঁপ, চিলোনি, লালি কতরকম গাছ।

বিশু বলল--- বনে হরিণ আছে, বাঘ কোথায়?

কাঠবিড়ালি, শিয়াল, বনবিড়াল, গিরগিটি আছে। আর অনেক গাছ। শাল, সেগুন, অর্জুন, হরিতকি, আম, লিচু।

সবার কথা শুনে ক্লাসের সকলেই বুঝল, গাছ সব বনেই আছে। জীবজন্তু সব বনেই আছে। তবে সব বনে একরকম গাছ নেই। নানা বনে জীবজন্তুও আলাদা।

দিদি বললেন— শুনলে তো, বনে কী কী থাকে! বাগানে যেসব গাছ থাকে সেগুলোও বনে থাকে। বনে মাঝে মাঝে জলাভূমিও থাকে। বনে গেলে শোনা যায় নানারকম পোকা, পশুপাখিদের ডাক। এসব নিয়েই বন।

বলাবলি করে লেখো

তোমার কাছাকাছি যে বন আছে সেখানকার পশু, গাছপালা ও বনজ উৎপাদনের কথা লেখো :

বনের গাছপালার নাম	বনের পশুদের নাম	বন থেকে তোমরা কী কী পাও	বনের কী কী অন্য জায়গায় চলে যায়

বন থেকে কী কী পাই

বনের গাছ আমাদের নানা কাজে লাগে। দরজা-জানালা-টেবিল-চেয়ার তো আছেই। গাছের ছাল থেকে মশলা হয়।

একথা শুনে ফরিদা বলল— ছাল থেকে ওষুধও হয়। দড়ি তৈরির আঁশও হয়।

জন বলল—পাতা, লতা থেকেও ওষুধ হয়। আগে গাছের পাতার উপর লেখা হতো। এখনও গাছ থেকেই কাগজ হয়। এছাড়া ফুল, ফল তো আছেই। পাতা থেকে থালা, বাটি হয়।

এসব শুনে দিদি বললেন— বাঃ! এই তো অনেক কিছু জানো।

কেয়া বলল— বনের কিছু গাছ খুব লম্বা। নারকেল, তাল, শাল। বট, অশ্বত্থ আবার চারদিকে ছড়িয়ে বিরাট গাছ।

—এভাবেও গাছের আলাদা দল করতে পারো। কলা, পেঁপে নরম কাণ্ডের গাছ । শাঁকালু লতানো গাছ। কিছু গাছ খুব ভিজে মাটিতে হয়। কিছু গাছ জলেও হয়। কারো পাতা ঝরে পড়ে। কারো পাতা আবার সবসময় সবুজ।

খোঁজাখুঁজি করে বলাবলি করে লেখো

১। কোন গাছের কোন অংশ থেকে কী হয় তা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বড়োদের কাছে জেনে নাও, আলোচনা করে লেখো :

ওষুধ	
দড়ি	
আসবাবপত্রের কাঠ	
কাগজ	
মশলা	
ফল	
ফুল	

২। তোমার এলাকায় এমন বিভিন্ন ধরনের কী কী গাছ পাওয়া যায়? খুঁজে দেখে, আলোচনা করে লেখো:

লম্বা গাছ	ছড়ানো বড়ো গাছ	নরম কাণ্ডের গাছ	লতানো গাছ	স্যাঁতসেঁতে মাটির গাছ	জলাভূমির গাছ

হারিয়ে যাওয়া বন আর নতুন বন

অল্প কিছু দিন আগেও স্থলের বেশিরভাগটাই ছিল বন। চাষ করতে শেখার আগে মানুষ বিশেষ গাছ কাটত না। একসময় মানুষ চাষ করতে শিখল। গাছ কাটার ধারালো অস্ত্র বানাল। এবার দরকার চাষের জমি। শুরু হলো গাছ কাটা। চাষের জমি বাড়াতে গিয়ে বন

কমতে থাকল। তবে তখন এত লোকজন ছিল না। তাই গাছ কাটা হলেও, অনেক বন-জঙ্গল ছিল। অনেক কাল আগে ভারতে রাজারা বনের ওপর কড়া নজর রাখত। বন থেকে কাঠ তো পাওয়া যেতই। এমনকি হাতিও পাওয়া যেত। যে বনে হাতি থাকত তার উপর রাজার দখল ছিল। সেই হাতি রাজার সেনাবাহিনীতে কাজে লাগত। ভারতে হাতি যুদ্ধের কাজে খুব ব্যবহার হতো। তাই হাতি-বনগুলির খুব গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া বনে অনেক মনুষ থাকত। তারপর একসময়ে লোক অনেক বাড়তে থাকে। তখন চাষের জমিও বাড়াবার দরকার হয়। নতুন নতুন থাকার জায়গারও প্রয়োজন হয়। তৈরি হলো নগর, শহর। এক জায়গায় অনেক মানুষ ভিড় করতে থাকল। কিন্তু শহরের বাতাসে বেড়ে গেল ধুলো-ধোঁয়া। গাছের পাতা ধুলোয় ঢেকে গেল। শ্বাসকষ্টের অসুখ, মৃত্যু বাড়াও শুরু হলো। গাছের পাতা ছাড়া অক্সিজেন পাওয়া যাবে না

একথা কিছু লোক বুঝল। যতজনকে পারল বোঝাল। কিন্তু বনের আকার ছোটো হতেই থাকল।

চাষ করলেও গাছ থাকে। কিন্তু শহর বাড়তেই থাকলে? ক্রমে চাষের জমিও কমতে থাকল। শুরু হলো খাদ্যের অভাব। ফল খাবে? ফলের গাছও বেশি নেই। সেও তো কাটা পড়েছে! বন নেই, পশুরা বারবার লোকালয়ে চলে আসছে! ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে। ফসল নষ্ট করছে।

এবার নিজেদের ভুল বোঝা শুরু হলো। ফলের এত দাম। তাই অনেক লোক ফলের গাছ কাটা বন্ধ করল। অনেকে চাষের জমিতে ফলের গাছও লাগাল। পেয়ারা গাছ। কলা গাছ। আম গাছ। প্রথম কয়েক বছর ফল, ফসল দুইই হলো। তারপর সেগুলো ফলের বাগান হয়ে গেল।

কাঠেরও তো দাম অনেক। তাই অনেকে ছোটো গাছ কাটা বন্ধ করল। কেউ কেউ পুকুর পাড়ে শাল, সেগুন গাছ লাগিয়ে দিল। কেউবা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। বাড়ির পাশে বা চাষের জমিতেই বনের এসব গাছ চাষ শুরু করল।

রাস্তার ধারে গাছ লাগানো শুরু হলো। সবদিক বজায় রেখে বাঁচার ভাবনা এল। শহর, গঞ্জেও গাছ চাই। কারখানার পাশেও গাছ চাই। বড়ো বন চাই। ছোটো বন চাই। তবেই উন্নত শিল্প কারখানা, গ্রাম-শহরের জীবন টেকসই হবে।

দিদিমার কাছে অসীম এসব মুগ্ধ হয়ে শুনল। ক্লাসে এসে সব বলল। দিদিমণি বললেন— লোকালয়ের মাঝেই এইসব ছোটো ছোটো বন হচ্ছে। এগুলোকে বলে সমাজভিত্তিক বন। তবে এধরনের বনও যথেষ্ট হয়নি। আমাদের দেশে বন কম। আমাদের রাজ্যে খুব কম। বড়ো বনেও গাছ কম। তাই সুযোগ পেলেই গাছ লাগাবে।

বেড়াতে গিয়ে বন দেখা

পথের পাশে একটা বড়ো বনের মতো। মোটা মোটা গাছ। তবে ফাঁকা ফাঁকা। কোনো গাছের গুঁড়ি হাত দিয়ে বেড় পাওয়া যায় না। বেড় দিয়ে ধরতে গেলে তিনজন মিলে ধরতে হবে। মামার বাড়িতে স্বপন আগেও এসেছে। কিন্তু এদিকটায় আসেনি। তাই এসব দেখেনি। সে ভাবল, কত বছরে গুঁড়িগুলো এত মোটা হয়েছে? কী গাছ এগুলো? পাতা দেখে মনে হয় আম গাছ। ভাবতে ভাবতে সাত-আট মিনিট হেঁটে ফেলল।

বনের ভিতরে একটা শান-বাঁধানো পুকুর রয়েছে। একটু একটু ভাঙা হলেও বেশ ভালো ঘাট। ঘাটে কেউ নেই। সন্ধে হয়ে আসছে। যদি পথ চিনতে অসুবিধে হয়? তাই বেশি ভিতরে গেল না। বাড়ি ফিরে গেল।

সব শুনে দাদু বললেন — ওটাকে বলে বিশালাক্ষীর আমবাগান। পুকুরটাকে বলে বিশালাক্ষীর পুকুর। আর একটু গেলেই বিশালাক্ষীর মন্দির। বাগানে কমপক্ষে দু-হাজার আম গাছ আছে। গাছগুলো কে লাগিয়েছে কেউ জানে না।

স্বপন বলল— শুধু আম গাছ লাগাল কেন?

— সে কি আর আমিই জানি? ছোটো থেকেই ওইরকম দেখছি। গাছগুলো তিন-চারশো বছরের পুরোনো। ঠাকুরদা বলত আগে অনেক রকম গাছ ছিল। এত বাড়ি তখন ছিল না। আরো বাগান ছিল। ওই বাগানেরই লাগোয়া। বাগান কেটে কেটে ঘরবাড়ি হতো। ফলের গাছগুলো

রেখে দিত। অন্য গাছ কেটে বাড়ির দরজা, জানালা, খাট-চৌকি করত। কাঁঠাল-জাম গাছও কাটত। আম খুব দামে বিক্রি হয়। তাছাড়া আম কাঠ বেঁকে যায়। তাই আমগাছগুলোই রয়ে গেল।

— আমগুলো বিক্রি করে কারা টাকা পায়?

— পঞ্চায়েতের থেকে আমের ব্যাপারীরা গাছ জমা নেয়। পাহারা দেয়। আম বেচে।

স্কুলে গিয়ে স্বপন মামাবাড়ির দেশের আমবাগানের কথা বলল। সবাই মন দিয়ে শুনল। আয়েসা বলল— আমার ফুফুর বাড়ির পাশেও ওইরকম বন আছে। এপার থেকে ওপার যেতে আধ ঘণ্টা লাগে। সেটাকে বলে দৌলত মাজারের বন। সেখানে আম গাছ নেই। শাল, শিশু, গামার গাছ আছে। ভিতরে মাজার তো। গাছ কাটা নিষেধ। কেউ কাটে না।

নিয়তি বলল— আয়েসা, মাজার মানে কীরে?

সে কিছু বলার আগেই রফিক বলল— মাজার মানে পির সাহেবের কবরস্থান।

নিয়তি সঙ্গে সঙ্গে বলল— ওহ, বুঝেছি।

দিদি বললেন— আমাদের বাড়ি এখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তরে। ওই বাড়ি থেকে আরও এক কিলোমিটার গেলে ওইরকম একটা বন আছে। সেটাকে লোকে বলে সাহেব জেনের বন।